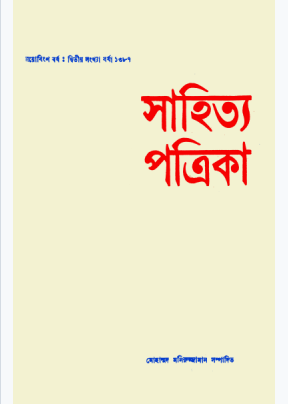

Vol. 23 | No. 2 | 1980

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সমকালীন দর্শন ও ভাষাবিশ্লেষণ

Volume	23
Issue	2
Year	1980
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	জামিমুল ইসলাম
Published online	June 1, 1980
DOI	10.62328/sp.v23i2.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v23i2.2
Pages	14-22
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

সমকালীন দর্শন ও ভাষাবিশ্লেষণ

আমিনুল ইসলাম

অংশতঃ বিজ্ঞানের প্রভাবে, এবং কিছুটা দর্শনের অন্তর্বিবর্তনের ফলে বর্তমান শতকের গোড়ার দিকে এক নতুন দার্শনিক আন্দোলনের উদ্ভব ঘটে। দর্শনের স্বরূপ ও উপজীব্য সম্পর্কে প্রচলিত মতের আমূল পরিবর্তন এবং এক নতুন ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গী প্রবর্তন এ আন্দোলনের লক্ষ্য। বর্তমানে গ্রেট বৃটেন, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি ইংরেজী ভাষাভাষী দেশে অত্যন্ত প্রভাবশালী এ নব্য-দর্শন ভাষাগত দর্শন বা বিশ্লেষণী দর্শন নামে পরিচিত। এ মতের দার্শনিকেরা মনে করেন যে, তাত্ত্বিক ধ্যান-অনুধ্যানের সাহায্যে কোন বিমূর্ত বা অতীন্দ্রিয় সত্তা আবিষ্কার দর্শনের কাজ নয়, হতে পারেও না। এ ধরনের কোন সত্তা আদৌ আছে কি-না, আর থেকে থাকলেও এর সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান অর্জন করা যায় কি-না, তা আমরা প্রায়োগিক ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে জানতে, কিংবা প্রচলিত ভাষায় প্রকাশ করতে পারি না। সুতরাং, বিমূর্ত তত্ত্বানুসন্ধানে গা ভাসিয়ে দিয়ে অতীতের দার্শনিকেরা যে এক পরাতাত্ত্বিক (Metaphysical) দর্শনের অনুশীলন ও প্রচার করেছেন, তা নিতান্তই অর্থহীন ও বিভ্রান্তিকর। এ পরিস্থিতিতে দর্শনের এক নতুন সংজ্ঞা নির্দেশ একান্ত আবশ্যক। এ নতুন সংজ্ঞা অনুসারে, ভাষার যৌক্তিক বিশ্লেষণ এবং শব্দ ও ধারণাবলীর অর্থ পরিষ্করণ দর্শনের মূল কাজ। দার্শনিক সমস্যা বলতে আমরা যা বুঝি, তা ভাষাগত সমস্যারই নামান্তর।

প্রথমেই বলে রাখা ভাল যে বিশ্লেষণী দর্শন বলতে একটি গোটা দার্শনিক আন্দোলনকে বুঝানো হলেও এর সাথে জড়িত দার্শনিকদের মধ্যে মতবাদের দিক থেকে তেমন কোন সাদৃশ্য দেখা যায় না। চিন্তার ক্ষেত্রে তাঁরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দাবীদার এবং মতবাদের কোন লেবেল পরতে তাঁরা নারাজ। এতে স্বাভাবিক কারণেই প্রশ্ন ওঠে: মতের মিল না থাকা সত্ত্বেও তাঁদের সকলকে একই নামে, অর্থাৎ বিশ্লেষণী দার্শনিক বা ভাষাগত দার্শনিক বলে সম্বোধন করা হয় কেন? এ প্রশ্নের একটি সহজ উত্তর এই যে, নামটি ব্যবহারের মূলে সংশ্লিষ্ট দার্শনিকেরা নিজেরা নন, তাঁদের সমালোচকেরা। তাঁদের অনুমোদনের অপেক্ষা না রেখেই নামটি ক্রমশঃ প্রচলিত হয়ে উঠেছে। প্রশ্নটির আর একটি উত্তর এই যে, সূক্ষ্ম মতাবলীর দিক থেকে না হলেও, পদ্ধতির দিক থেকে এ-সব দার্শনিকের মধ্যে একটি বিরাট মিল রয়েছে। যেমন, তাঁরা সবাই স্পেকুলেটিভ বা অনুধ্যানমূলক দার্শনিক পদ্ধতির বিরোধী এবং যৌক্তিক ও ভাষাগত বিশ্লেষণকে দার্শনিক পদ্ধতি হিসাবে প্রবর্তনের পক্ষপাতী। এ-সব কারণেই তাঁদের একই গোষ্ঠীভুক্ত বলে গণ্য করা হয়, একই নামে সম্বোধন করা হয়।

কারো কারো মতে, পারমেনাইডিস-প্লেটো প্রমুখ প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকের রচনাবলীতে এই দর্শনের বীজ নিহিত ছিল। এ মতের হয়তবা কিছুটা সত্যতা আছে; কিন্তু এ-কথা অনস্বীকার্য যে, বিশ্লেষণী দর্শনের প্রচার ও প্রসার সাম্প্রতিক কালের

ব্যাপার; আর এর সূত্রও খুঁজে পাওয়া যায় সাম্প্রতিক দার্শনিকদের চিন্তায়। এদিক থেকে বিচার করলে আমরা মোটামুটিভাবে এর তিনটি সূত্র খুঁজে পাই; যথা ১. কেম্‌ব্রিজ আন্দোলন, ২. ভিয়েনা চক্র, এবং ৩. অক্সফোর্ড দর্শন।

প্রথমেই ধরা যাক কেম্‌ব্রিজ আন্দোলনের কথা। বিশ্লেষণী ভাবধারাটিকে প্রথমেই কেন্দ্রীভূত হতে দেখা যায় কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। এরপর ক্রমশঃ তা সমগ্র গ্রেট-বৃটেনে বিস্তার লাভ করতে থাকে। এমনকি, একদা ভাববাদের লীলাভূমি বলে পরিচিত অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়েও তা অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠে। কেম্‌ব্রিজ আন্দোলনের সাথে জড়িত দার্শনিকদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন জি. ই. মূর ও বার্ট্রাণ্ড রাসেল। গ্রীণ, ব্র্যাডলী, ম্যাক্‌টেগার্ট প্রমুখ সেদিনের প্রভাবশালী ভাববাদীর চরম একত্ববাদের বিরোধিতা থেকেই শুরু হয় মূর-রাসেলের দার্শনিক অভিযান।

মূরকে বলা চলে বিশ্লেষণী দর্শনের মূল উৎস ও অনুপ্রেরণা। দর্শনের সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে অনেকটা আকস্মিকভাবে। ১৮৯২ সালে তিনি কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন ক্লাসিক্‌স-এর ছাত্র হিসাবে। বার্ট্রাণ্ড রাসেলের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় তিনি তাঁর কেম্‌ব্রিজ জীবনের দ্বিতীয় বছরে দর্শনকে পাঠ্যবিষয় হিসাবে নির্বাচন করেন। সে দিনের কেম্‌ব্রিজে ভাববাদের প্রভাব ছিল অপরিমেয়। ব্র্যাডলী, ম্যাকটেগার্ট প্রমুখ ভাববাদীর মতের বিরুদ্ধে মুখ খুলে কিছু বলা তখন ছিল অনেকটা ধৃষ্টতা। ঠিক এই পরিবেশেই শুরু হয় মূরের দর্শনচর্চা। ভাববাদীদের মতাবলী মূরের কাছে কেমন যেন কিম্ভূত ও নিরর্থক বলে মনে হল। যেমন, ম্যাকটেগার্ট যখন বলেন, "সময় অলীক," মূর তাতে বিস্মিত হলেন; কারণ তিনি এ-কথার কোন অর্থই খুঁজে পেলেন না। মূরের প্রশ্ন: সময় যদি অলীক হয়, তাহলে কি এ-কথা ঠিক নয় যে, আমরা মধ্যাহ্নভোজের পূর্বে প্রাতরাশ করে থাকি? ভাববাদীদের এ-জাতীয় অনেক কথাই মূরের কাছে অবাস্তব ও নিরর্থক বলে মনে হল। এসবের বিরুদ্ধে তাই তিনি জানালেন তীব্র প্রতিবাদ এবং গড়ে তুললেন সহজবুদ্ধি-সমর্থিত এক নতুন দার্শনিক মতবাদ। সহজ অভিজ্ঞতায় যাদের প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায় না, এসব বিমূর্ত ও চেতনাতীত ধারণা বা সত্তার কথা বলে মানুষকে শুধু বিভ্রান্তই করা হয়। সার্থক দর্শনের কাজ তা নয়, হতে পারে না। যথার্থ দার্শনিকের কাজ যথাযোগ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিজ বক্তব্যকে সুস্পষ্ট করে ব্যক্ত করা। অর্থাৎ, আমরা যে ভাষায় কথা বলি এবং যাকে নিয়ে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বেচা-কেনা, সেই প্রচলিত ভাষার বিশ্লেষণই দর্শনের কাজ, এর মূলউৎস ও উপজীব্য।

বিশ্লেষণের গুরুত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মূর তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "প্রিন্সিপিয়া এথিকা"-র মুখবন্ধে বলেন: "আমার মনে হয়, নীতিবিদ্যাসহ দর্শনের বিভিন্ন শাখার পঠন-পাঠনে যে-সব অসুবিধা ও মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়, তাদের মূল কারণ একটি। যথা, যে প্রশ্নের উত্তর প্রত্যাশা করা হয়, তার স্বরূপ না জেনেই উত্তর দেয়ার প্রচেষ্টা। উত্তর খোঁজার আগেই সংশ্লিষ্ট প্রশ্নটিকে সঠিকভাবে বোঝার চেষ্টায় যদি দার্শনিকেরা ব্রতী হতেন, তাহলে আলোচ্য ভুলের সংশোধন কতটুকু হতো জানি না; তবে এ ধরনের জোরদার প্রচেষ্টা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সফলকাম হতো বলেই আমার ধারণা।" এ উক্তি থেকে বিশ্লেষণের প্রতি মূরের সমর্থন সুস্পষ্ট। এটা অবশ্য দর্শনে নতুন কিছু নয়। এর আগেও হব্‌স, লক, বার্কলে, হিউম ও আরো অনেক বৃটিশ দার্শনিক এ ধরনের কথা বলেছেন। মূরের ন্যায় তাঁরাও বিশ্বাস করতেন যে, দার্শনিক অনুসন্ধানের যথার্থ বাহন হবে সহজ, সরল ভাষা এবং দার্শনিক সমস্যাবলীকে ঢালাই করতে হবে সহজ, প্রাঞ্জল বচনে। আবশ্য, এ-কথাও ঠিক যে, মূরের ন্যায় এত নিষ্ঠার সাথে অতীতে অন্য

কেউ এ নীতি ব্যাখ্যা করেননি, এবং আগে কোনদিন তা একটি সম্পূর্ণ দার্শনিক আন্দোলনের ভিত্তি হিসাবেও ব্যবহৃত হয়নি। বিশ্লেষণের সমর্থক হিসাবে মূরের সাথে তাঁর পূর্বসূরীদের মূল পার্থক্য এখানেই।

মূরের মতে, দার্শনিক বিশ্লেষণের কাজ হলো উত্থাপিত প্রশ্নাবলীর স্বরূপ আবিষ্কার ও তাদের অর্থনিরূপণ। এ-সব প্রশ্নের উত্তর যে দর্শনকে সরবরাহ করতেই হবে, এমন কোন কথা নেই। দর্শনের কাজ কোন প্রশ্নের সদুত্তর আবিষ্কার নয়, বিমূর্ত, বিচ্ছিন্ন ধারণাবলীর সমীক্ষা মাত্র।

মূরের দার্শনিক পদ্ধতি ও মতবাদ যাঁদের প্রভাবিত করেছে, তাঁদের মধ্যে এ-কালের অন্যতম বৃটিশ লেখক ও দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড রাসেলের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮৯০ থেকে শুরু করে ১৯১৬ পর্যন্ত এবং পরবর্তী পর্যায়েও বেশ কিছুদিন রাসেল কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে কাটিয়েছেন। সমকালীন ভাববাদের বিরুদ্ধে মূর-দর্শনে যে প্রতিবাদ, তা অধিকতর প্রকট হয়ে ওঠে রাসেলের দর্শনে। তবে মূর ও রাসেলের মধ্যে পার্থক্যও ছিল যথেষ্ট। যেমন, রাসেল মূরের মত দর্শনকে সহজ অভিজ্ঞতাগম্য মামুলী বচনাদির বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা বলে মনে করেন না। তাঁর মতে প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত মামুলী ভাষা এবং উচ্চতর দার্শনিক ভাষার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। এ-কথা ঠিক যে প্রাত্যহিক জীবনের কথাবার্তায় ব্যবহৃত ভাষা সহজ-সরল হয়ে থাকে, এবং তা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু, দর্শনের ভাষাও যে অনুরূপভাবে সকলের কাছে বোধগম্য হবে এমন আশা করা অনুচিত, কারণ এই দুই ভাষার স্বভাব এক নয়, স্বতন্ত্র। তাই একজন সহজবুদ্ধি লোকের কাছে কোন একটি দার্শনিক উক্তি দুর্বোধ্য বলে মনে হতে পারে, কিন্তু তাতেই যে ঐ উক্তিটি নিরর্থক হয়ে যাবে, এমন কথা বলা চলে না। শুধু দর্শন কেন, বিজ্ঞানেও (যেমন উচ্চতর গণিতে) যে ভাষার প্রচলন, তা সাধারণ মানুষের কাছে বোধগম্য নয়; কিন্তু তাতে ঐ ভাষা নিরর্থক প্রতিপন্ন হয় না। দর্শনকে রাসেল মনে করেন গণিতশাস্ত্রের মত একটি আরোহী প্রাকসিদ্ধ বিজ্ঞান বলে। দর্শনের আলোচনার বিষয় বিমূর্ত ধারণাবলী ও যৌক্তিক সম্ভাবনার জগৎ।

ব্র্যাডলি, ম্যাকটেগার্ট প্রমুখ ভাববাদীর চরম একত্ববাদী মতবাদের বিরোধিতা করে রাসেল প্রবর্তন করলেন এক বহুত্ববাদী আধিবিদ্যিক মতবাদ। তার এ মতবাদ "লজিক্যাল এটমিজম" বা "যৌক্তিক পরমাণুবাদ" বলে পরিচিত। এ মত অনুসারে, অসংখ্য যৌক্তিক পরমাণুর সমন্বয়ে জগৎ গঠিত। এ পরমাণুগুলো পরস্পর স্বতন্ত্র। আবার এরা মন বা চেতনার সাহায্য ছাড়াই স্বাধীনভাবে থাকতে পারে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বস্তু বলতে রাসেল শুধু ভৌত বস্তুকেই বোঝেননি। সম্বন্ধ ও গাণিতিক সত্তাবলীকেও তিনি বস্তুর মর্যাদাসম্পন্ন বলে মনে করেন।

রাসেলের মতে, ভাষা হলো সত্তার ব্যাখ্যা ও ভাষ্য; আর এ-জন্যই তিনি মনে করেন যে, ভাষার কাঠামো থেকে সত্তার স্বরূপ অনেকাংশে বোঝা সম্ভব। পূর্ণ ও নিখুঁত ভাষার পরিপূর্ণ ও আদর্শ রূপ হিসাবে রাসেল অবতারণা করলেন এমন এক যুক্তিবিদ্যার, যাকে তিনি ধরে নিলেন সত্তার সার্থক প্রতিবিম্ব হিসাবে।

ওপরের আলোচনা থেকে এটুকু বোঝা যায় যে, মূর-রাসেলের দর্শনে প্রাচীন তত্ত্বপ্রধান দর্শনের বিরুদ্ধে যত প্রতিবাদই থাক্ না কেন, তাঁদের দু'জনের কেউই অধিবিদ্যার সম্ভবপরতা অস্বীকার করেননি। অধিবিদ্যার সম্ভবপরতার বিরুদ্ধে প্রথম অভিযান শুরু হয় "যৌক্তিক দৃষ্টবাদী" (Logical positivists) নামে পরিচিত

এক মহাদেশীয় দার্শনিক গোষ্ঠীর লেখায়। ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক মরিট্‌স শ্লিক পরিচালিত এক সেমিনার থেকেই "ভিয়েনা চক্র" নামে এই দার্শনিক গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে। ১৯২৭ সালে কার্নপ ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন এবং ভিয়েনা চক্রের আলোচনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে থাকেন।

১৯২১ সালে প্রকাশিত ভিট্‌গেনস্টাইনের অধিবিদ্যা-বিরোধী গ্রন্থ 'ট্র্যাকটেটাস'-কে ভিয়েনা চক্রের সদস্যরা তাঁদের দার্শনিক প্রেরণার মূল উৎস বলে মনে করেন। ভিট্‌গেনস্টাইনের মতে, দর্শনের মূল লক্ষ্য সম্প্রসারণমূলক, 'চিন্তার যৌক্তিক বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা'। জগৎ-বিষয়ে কোন ব্যাপক তত্ত্ব বা নীতি প্রদান দর্শনের কাজ নয়। কোন শব্দ যখন ভাষায় ব্যবহৃত হয়, তখন তা কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হল এবং কোন শব্দকে সার্থকভাবে ব্যবহারের উপায় কি?—প্রভৃতি প্রশ্নের সদুত্তর আবিষ্কার-ই দর্শনের মূল কাজ। তবে দর্শনের স্বরূপ সম্পর্কে ভিট্‌গেনস্টাইন-এর মতে দর্শনে অধিবিদ্যা (Metaphysics)-র কোন স্থান নাই। আধিবিদ্যিক (Metaphysical) বচনাদির ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে ভিট্‌গেনস্টাইন তাঁর বিখ্যাত প্রথম গ্রন্থ 'ট্র্যাক্‌টেটাস লজিকো ফিলোসফিকাস্'-এ বলেন: "যা বলা যায়, তা পরিষ্কারভাবে বলা যায় (অর্থাৎ বিজ্ঞানের বিশুদ্ধ ভাষায় বলা যায়)"; আর "যে বিষয়ে কেউ পরিষ্কারভাবে কিছু বলতে পারে না, সে বিষয়ে তার চুপ থাকাই বাঞ্ছনীয়।"[১] অধিবিদ্যার সম্ভবপরতা অস্বীকার করলেও ভিট্‌গেনস্টাইন যৌক্তিক দৃষ্টবাদের বিঘোষিত নীতির সমর্থন করেননি। পরন্তু তিনি দৃষ্টবাদী দর্শনের মূল ভিত্তি পরখ-নীতিকে 'ননসেন্স' বা নিরর্থক বলে প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ, এই নীতি অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ নয় এবং এর যথার্থতা ও তাৎপর্য্য অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে প্রতিপাদন করা যায় না। মোট কথা, পরখ-নীতির সংকীর্ণ আওতায় আবদ্ধ থাকার কোন যুক্তিই ভিট্‌গেনস্টাইন খুঁজে পাননি।

যাই হোক, বিমূর্ত ধ্যান-অনুধ্যানের মাধ্যমে পারমার্থিক সত্তা, তথা জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে বিচারমূলক জ্ঞান লাভের যে প্রত্যয় ও প্রচেষ্টা দর্শনের সুদীর্ঘ ইতিহাসে দেখা যায়, যৌক্তিক দৃষ্টবাদীদের মতে তা সম্পূর্ণ নিরর্থক। তাঁরা দর্শনের প্রাচীন সংজ্ঞা প্রত্যাখ্যান করে এক বিকল্প সংজ্ঞার অবতারণা করেন। এই নতুন সংজ্ঞা অনুসারে, দর্শন বিজ্ঞানের যৌক্তিক বিশ্লেষণ বা বিজ্ঞানের লজিক। কোনরকম তথ্য বা সত্তা আবিষ্কার দর্শনের কাজ নয়। জ্ঞান আহরণ ও বিতরণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ভাষার যৌক্তিক বিশ্লেষণই দর্শনের আসল কাজ।

দৃষ্টবাদীরা অর্থপূর্ণ বচনকে সংশ্লেষক ও বিশ্লেষক—এই দুইভাগে ভাগ করেন। যে-সব বচনের অর্থ ও সত্যাসত্য অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রতিপাদন করা চলে, তারা হলো সংশ্লেষক; আর যাদের অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষভাবেই বোঝা যায়, তারা হলো বিশ্লেষক। দু'টি উদাহরণের সাহায্যে এই দুই প্রকার বচনের পার্থক্য ব্যাখ্যা করা যাক্।

১. বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে

২. সব কুমার অবিবাহিত

১নং বচনটির সত্যাসত্য নিরূপণের জন্য অভিজ্ঞতা আবশ্যক, অতএব বচনটি সংশ্লেষক। কিন্তু ২নং বচনটির সত্যাসত্য নিরূপণের জন্য কোনরূপ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন

১ Tractatus Logico Philosophicus (1922), pp. 79, 189

নেই ; এর অন্তর্ভুক্ত শব্দ দুটোর অর্থের সাথে পরিচয়ই এর সত্যাসত্য জানার জন্য যথেষ্ট। কুমারের সংজ্ঞা থেকে বোঝা যায় যে, কুমার হওয়া আর অবিবাহিত হওয়া একই কথা, কিংবা অবিবাহিত না হলে কারো পক্ষে কুমার হওয়া সম্ভব নয়। এই সত্য জানার জন্য কেউ যদি কুমার সম্প্রদায়ের আদমশুমারের অভিযান চালান, তা হবে একটি অনাবশ্যক ও হাস্যকর ব্যাপার। অর্থাৎ, ২নং বচনের জ্ঞান পূর্বতসিদ্ধ, আর এর সত্যতা অস্বীকার করা হবে একটি স্ববিরোধী কাজ। তাহলে বোঝা গেল যে, বিশ্লেষক বচনের জ্ঞান পূর্বতসিদ্ধ, আর সংশ্লেষক বচনের জ্ঞান পরতসাধ্য। প্রথমটি অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ, আর দ্বিতীয়টি অভিজ্ঞতা-নির্ভর।

বচনের এই শ্রেণীবিভাগের ফলে Synthetic a priori বা পূর্বতসিদ্ধ সংশ্লেষক বলে কোন বচন থাকতে পারে কি-না, এ প্রশ্নটি স্বভাবতই জাগে। প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে দর্শনের ইতিহাসে তুমুল বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশেষ করে বুদ্ধিবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদের মূল বিরোধের মূলে এ প্রশ্নটিই। ওপরের উদাহরণের ২নং বচনটির স্বভাব বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তা কতিপয় ধারণার সম্বন্ধ ও অর্থবিষয়ক ; কিন্তু ১নং বচনটি যেহেতু সংশ্লেষক, সেই জন্য শুধু তথ্য সরবরাহ করাই এর কাজ। কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই এর সত্যাসত্য প্রতিপাদন করা যায়। অভিজ্ঞতা-বাদী ও বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের বিতর্কের মূলে যে প্রশ্নটি প্রাসঙ্গিক তা হলো এই : তথ্যজ্ঞাপক জ্ঞান কি পূর্বতসিদ্ধ হতে পারে ? (ধারণাগত জ্ঞান যে পূর্বতসিদ্ধ তা অবশ্য উভয় দলের দার্শনিকেরাই স্বীকার করেন)। সাধারণতঃ সব তথ্যগত জ্ঞান সংশ্লেষক বচন থেকে প্রাপ্ত, কিন্তু এখন প্রশ্ন হলো : সংশ্লেষক বচনের জ্ঞান পূর্বতসিদ্ধভাবে পাওয়া যায় কি-না। উত্তরে বুদ্ধিবাদীরা বলেন "হ্যাঁ" ; আর অভিজ্ঞতাবাদীরা বলেন "না"।

যে-সব বচনকে অতীতে Synthetic a priori বা পূর্বতসিদ্ধ বিশ্লেষক বলা হতো, তারা গণিত, অধিবিদ্যা, ধর্ম ও নীতিবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। যেমন :

(ক) ৭+৫=১২
(খ) প্রত্যেক কার্যেরই একটি কারণ আছে
(গ) সুখ স্বতঃশুভ
(ঘ) প্রত্যেকেরই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা উচিত
(ঙ) ঈশ্বর আছেন

এ-সব বচনের সত্যতা অস্বীকার করাতে কোন স্ববিরোধ নেই ; কিন্তু, তবুও অনেকের মতে এদের কোনটিই বিশ্লেষক নয়।[২] অর্থাৎ, এরা সংশ্লেষক। তবে, যে-কোন সংশ্লেষক বচনের ন্যায় এদের সত্যাসত্য প্রায়োগিক উপায়ে নির্ণয়ের প্রশ্নও ওঠে না,[৩] আর এজন্যই কেউ কেউ মনে করেন যে, এসব বচন পূর্বতসিদ্ধ। অর্থাৎ, এসব বচন পূর্বতসিদ্ধ ঠিকই, কিন্তু বিশ্লেষক নয় ; এরা পূর্বতসিদ্ধ সংশ্লেষক বচন।

২ (ক), (ঘ), (ঙ)-কে কেউ কেউ বিশ্লেষক বলে বর্ণনা করেছেন।

৩ অবশ্য এসব বচনের সবগুলোই যে ঠিক এক রকমের তা নয়। ইচ্ছা করলে কেউ ৭টি আপেলের সঙ্গে ৬টি আপেল যোগ করে (ক)-এর সত্যতা প্রমাণ করতে পারে। তবে তা ঠিক হলেও আবশ্যক নয়। যেমন ৭০,০০০০০ এর সঙ্গে ৫০,০০০০০ যোগ করলে যে ১২০,০০০০০ হয়, তা বোঝার জন্য কোন বস্তুর সাহায্য নেয়া শুধু অনাবশ্যকই নয়, হাস্যকরও বটে। অন্যদিকে আবার এটাও ঠিক নয় যে, (ঘ) ও (ঙ)-এর সত্যতা প্রতি-পাদনের কোন প্রয়োগিক উপায় আছে।

এ প্রসঙ্গে যৌক্তিক দৃষ্টবাদীরা মনে করেন যে, পূর্বতসিদ্ধ সংশ্লেষক বচন বলে কিছু নেই। বচনের স্বভাব হবে হয় সংশ্লেষক, অথবা বিশ্লেষক। এ-ছাড়া তৃতীয় প্রকারের কোন বচন নেই। পূর্বতসিদ্ধ সংশ্লেষক বচন অস্বীকার করার পেছনে দৃষ্টবাদীদের যে কি অসুবিধা, তা বোঝা কঠিন নয়। এধরনের কোন বচন মেনে নেবার অর্থ হবে এ-কথা স্বীকার করা যে, অভিজ্ঞতার পক্ষে প্রামাণিক ও নির্ভরযোগ্য জ্ঞানের উৎপত্তি বোধ (understanding) থেকে, বাহ্যঅভিজ্ঞতা থেকে নয়। এজন্যই পূর্বতসিদ্ধ সংশ্লেষক জ্ঞানের একনিষ্ঠ সমর্থক ইম্যানুয়েল কাণ্ট বলেছেন যে পূর্বতসিদ্ধ সংশ্লেষক জ্ঞান স্বীকার না করলে অধিবিদ্যার সম্ভবপরতাকে অস্বীকার করতে হয়। আর ঠিক এই যুক্তিতেই দৃষ্টবাদীরা অধিবিদ্যার সম্ভবপরতাকে অস্বীকার করলেন।

সংশ্লেষক ও বিশ্লেষক বচনকে ভিন্ন স্বভাবের বলে পৃথক করে দিয়ে তাঁরা ঘোষণা করলেন যে, সংশ্লেষক বচনের অর্থ ও সত্যাসত্য প্রতিপাদনের উপায় প্রায়োগিক পর্যবেক্ষণ; আর বিশ্লেষক বচনের অর্থ প্রতিপাদনের মানদণ্ড হবে লজিক ও গণিত-শাস্ত্র। অধিবিদ্যা, ধর্মতত্ত্ব ও নীতিবিদ্যার ক্ষেত্রে এই নীতির প্রয়োগ করে দৃষ্টবাদীরা সিদ্ধান্ত করলেন যে, এসব বিষয়ে ব্যবহৃত ভাষা অর্থহীন, কেননা উল্লিখিত দুই উপায়ের কোনটিতেই এ ভাষার অর্থ প্রতিপাদন সম্ভব নয়।

যৌক্তিক দৃষ্টবাদীরা স্বপ্ন দেখলেন এমন এক আদর্শ ভাষার, যা হবে সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন। এ ভাষায় একদিকে প্রতিপালিত হবে বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ নীতি, অন্যদিকে এতে অনুশীলন করা হবে যুক্তিবিদ্যার বিশ্লেষণী পদ্ধতি।

পর্যবেক্ষণপ্রসূত কতিপয় স্পষ্ট মানদণ্ড এবং কিছু সাঙ্কেতিক প্রতীকের ব্যবহার এ ভাষাকে দ্ব্যর্থহীন করে তুলবে। দৃষ্টবাদীদের বিশ্বাস, এ আদর্শ ভাষা প্রণয়ন করা গেলে যে-কোন দার্শনিক সমস্যার দ্রুত সমাধান সম্ভব হবে। এ আদর্শ ভাষার কষ্টিপাথরে যেসব তথাকথিত দার্শনিক সমস্যার সমাধান করা যাবে না, তাদের অবশ্যই নিরর্থক বলে প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

বলা বাহুল্য, এ ধরনের একটি ভাষা তৈরী করা গেলে দর্শনের বহুবিতর্কিত অনেক সমস্যার হয়ত সমাধান হয়ে যেত। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, দীর্ঘ দিনের চেষ্টার পরও আজ অবধি দৃষ্টবাদীরা এ ধরনের একটি ভাষা প্রণয়ন করতে পারলেন না; আর তা প্রণয়ন করা আদৌ সম্ভব বলে মনে হয় না। এ ধরনের একটি আদর্শ ভাষার স্বপ্ন যে নিছক একটি স্বপ্নই, এর বাস্তবায়ন যে অসম্ভব, এ ধরনের মন্তব্যও এসেছে বিশ্লেষণী দার্শনিকদেরই অপর এক শাখা থেকে। "অক্সফোর্ড দর্শন" ও "মামুলী ভাষাদর্শন" (Ordinary Language Philosophy) বলে পরিচিত এই দার্শনিক গোষ্ঠীর মতে, দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত মামুলী ভাষা দার্শনিক আলোচনার জন্য সম্পূর্ণ উপযোগী। দর্শনে কোন টেকনিক্যাল ভাষার ব্যবহার শুধু অনাবশ্যকই নয়, বিভ্রান্তি-করও বটে। এ মতের দার্শনিকেরা মনে করেন যে, অতীতের দার্শনিক সমস্যাবলীর অধিকাংশই ছিল ভাষাগত বিভ্রান্তির ফলশ্রুতি। কার্য-কারণ, সংবেদন, ইচ্ছার স্বাধীনতা ইত্যাদি শব্দ যেসব প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, এবং যে পরিপ্রেক্ষিত থেকে এদের উৎপত্তি, প্রায়ই তাদের সেই প্রসঙ্গ ও পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিচ্ছিন্ন করে কতকগুলো তথাকথিত দার্শনিক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। সহজ, চলতি ভাষাকে এ-ভাবে বিকৃত করে অতীতের দার্শনিকেরা যুগযুগ ধরে কতকগুলো সমাধানহীন বানোয়াট সমস্যার গোলক-ধাঁধাঁয় সমাচ্ছন্ন হয়েছিলেন। প্রচলিত ভাষাবিশ্লেষণী দার্শনিকেরা মনে করেন যে,

এ-সব ধানোয়াট সমস্যা থেকে অব্যাহতি পেয়ে সুষ্ঠু দর্শন অনুশীলনের জন্য প্রয়োজন ভাষার সার্থক ব্যবহার ও বিশ্লেষণ।

তাঁদের মতে ভাষাকে তুলনা করা চলে যে-কোন খেলা বা খেলাসমষ্টির সঙ্গে। কোন খেলা বোঝার বা উপভোগ করার পূর্বশর্ত যেমন এর নিয়মাবলীকে জানা, ঠিক তেমনি ভাষাকে বোঝা ও সঠিকভাবে ব্যবহার করার জন্যও আবশ্যক তার নিয়মাবলীর অনুধাবন ও প্রয়োগ। রীতি-নিয়ম না-জানার ফলে ভাষা ব্যবহারে আমরা যেসব দার্শনিক বিভ্রান্তি বা অনুপপত্তির সম্মুখীন হতে পারি, একমাত্র ভাষাবিশ্লেষণের মাধ্যমেই তা এড়ানো সম্ভব। যেমন, 'দৌড়ানো' কথাটি একটি ক্রিয়ার নির্দেশক। এটি যে কোন বস্তুর নাম বা বিশেষ্য নয়, তা জানা যায় একমাত্র ব্যাকরণগত নিয়মাবলীর জ্ঞান থেকে। ব্যাকরণের জ্ঞান ভাষা-বিশ্লেষণের জন্য অপরিহার্য। যিনি ব্যাকরণের নিয়মাবলীর সঙ্গে পরিচিত, তিনি অবশ্যই জানেন যে, বিশেষ্যনিয়ন্ত্রক নিয়মাবলী আর ক্রিয়ানিয়ন্ত্রক নিয়মাবলী এক নয়, স্বতন্ত্র।

এখন প্রশ্ন হলো: ভাষাসংক্রান্ত নিয়মাবলীর অনুশীলন ও প্রয়োগের মাধ্যমে আমরা ভাষার দুর্বোধ্যতাকে সম্পূর্ণ দূর করে একটি দ্ব্যর্থহীন আদর্শ ভাষা তৈরী করতে পারি কি? যৌক্তিক দৃষ্টবাদীরা এ ব্যাপারে চেষ্টা করে যে ব্যর্থ হয়েছেন, একথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। অক্সফোর্ড দার্শনিকদের মতে, একাজ অসম্ভব। ভাষা কোন অবস্থাতেই বস্তুর বা ধারণার অবিকল ভাষ্য হতে পারে না, এতে অল্পবিস্তর দ্ব্যর্থতা থাকবেই। এমতাবস্থায় তথাকথিত 'ক্ল্যারিফিকেশন' বা স্পষ্টায়নের পিছু ধাওয়া না করে (যৌক্তিক দৃষ্টবাদীরা যেমন করেছিলেন) প্রচলিত ভাষার শব্দাবলীর ব্যবহার কতটুকু সঠিক ও নির্ভুল করা যায়, তার প্রতি যত্নবান হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, একটি বিশেষ শব্দ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। কোন্ শব্দের সঠিক অর্থ কি, তা বোঝাতে হলে প্রথমেই বোঝাতে হবে কোন্ প্রসঙ্গে এর ব্যবহার হলো। প্রসঙ্গকে বাদ দিয়ে একক কোন কাঠামোর সাহায্যে শব্দের সঠিক অর্থ নির্ণয় সম্ভব নয়।[৪] যেমন "বিষণ্ণ" কথাটি পরিস্থিতি ভেদে একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। এর অর্থ নির্ণয়ের জন্য একদিকে যেমন রয়েছে কতকগুলো ফিলিং বা অনুভূতিজনিত মানদণ্ড, অপরদিকে ঠিক তেমনি রয়েছে বিহেভিয়র‍্যাল বা আচরণগত মানদণ্ড। কোন্ পরিস্থিতিতে শব্দটি কি অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে, তা নির্ভর করছে "বিষণ্ণ" কথাটিকে বক্তা নিজের, না অন্য কারো বেলায় প্রয়োগ করছেন। নিজের কাছে নিজেকে "বিষণ্ণ" মনে হতে পারে অনুভূতির মাধ্যমে; আর অপরকে "বিষণ্ণ" দেখায় তার বাহ্যিক আচরণে। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, একই শব্দকে পরিস্থিতি ভেদে দুটো পৃথক মানদণ্ডের সাহায্যে বোঝা হলো। ভাষা কোন একক কাঠামো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়; এর জন্য একাধিক কাঠামো আবশ্যক—এই মতদ্বারা অক্সফোর্ড দার্শনিকবৃন্দ যৌক্তিক দৃষ্টবাদীদের একক ভাষা-কাঠামোর পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করেন। প্রায়োগিক বিজ্ঞানের ভাষাকে মডেল হিসাবে গ্রহণ করে দৃষ্টবাদীরা অধিবিদ্যা, নীতিবিদ্যা, ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতির ভাষাকে বিকৃত করার যে প্রয়াস পেয়েছিলেন অক্সফোর্ড দার্শনিকদের একাধিক ভাষা-কাঠামোর সমর্থনে তার প্রতিক্রিয়া সুস্পষ্ট। বস্তুতঃ, অধিবিদ্যা, নীতিশাস্ত্র ও ধর্মতত্ত্বের ভাষাকে অর্থহীন প্রতিপন্ন করার জন্য দৃষ্টবাদীরা যে মানদণ্ডের ব্যবহার করেন, তা শুধু প্রকৃতি-বিজ্ঞানের বেলায়ই প্রযোজ্য। এ-কথা তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন যে, বৈজ্ঞানিক ভাষার স্বভাব আর নৈতিক বা আধিবিদ্যিক ভাষার স্বভাব এক নয়, এবং তা নয় বলেই

৪ Wittgenstein, Philosophical Investigations, P. 46 e.

তাদের মূল্যায়নের মানদণ্ডও এক হতে পারে না। কিন্তু তবুও তাদের এক বলে ধরে নেয়া, এবং একই মানদণ্ডের সাহায্যে তাদের মূল্যায়নের চেষ্টা, অনেকটা বাস্কেটবল খেলার নিয়মাবলী দিয়ে ফুটবল খেলার বিচারের মত। বাস্কেটবল খেলায় বল-এ লাথি নিয়মবিরুদ্ধ, এ জন্যে ফুটবল খেলার সময় কোন খেলোয়াড়কে বলে লাথি দিতে দেখে যদি কেউ বলেন যে, উক্ত খেলোয়াড় (ফুটবল) খেলার নিয়ম অমান্য করেছে, তাহলে ব্যাপারটি হাস্যকর হবে বৈ কি।

এ যুক্তিতেই বলা চলে যে, প্রচলিত বৈজ্ঞানিক ভাষার অর্থ নির্ণয়ে ব্যবহৃত নীতি আধিবিদ্যিক ভাষার অর্থ নির্ণয়ে প্রযোজ্য হতে পারে না। কেননা যেসব (বিমূর্ত ও অতীন্দ্রিয়) বিষয় নিয়ে আধিবিদ্যিক ভাষার ব্যবহার, স্বভাবের দিক দিয়ে তারা সহজ অভিজ্ঞতার জগতের তথ্যগত মামুলী বচনের সমপর্যায়ভুক্ত নয়। আর এ-জন্যই, যে দৃষ্টি-কোণ থেকে এবং যে মানদণ্ডের নিরিখে মামুলী ভাষার অর্থ যাচাই করা হয়, ঠিক একই দৃষ্টিকোণ থেকে এবং ঠিক একই মানদণ্ডে আধিবিদ্যিক বচনের অর্থ যাচাই সম্ভব নয়। আধিবিদ্যিক বচনের বিষয়বস্তু সহজ অভিজ্ঞতা সম্পর্কীয় প্রায়োগিক বচনের চেয়ে এতই স্বতন্ত্র যে, অধিবিদ্যার ক্ষেত্রে যে যুক্তি-প্রমাণের ব্যবহার করা হয়, তা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের মত চূড়ান্ত হতে পারে না; কেননা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে প্রায়োগিক সুবিধা রয়েছে অধিবিদ্যার বিমূর্ত ও অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের বেলায় তা নেই। দুটোর বিষয়বস্তুর স্বভাব যেমন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তেমনি তাদের প্রমাণ-পদ্ধতি ও পরীক্ষণ-প্রতিপাদনের উপায়ও হবে স্বতন্ত্র।

সুগভীর ধ্যান-অনুধ্যান ও যৌক্তিক বিচার-বিশ্লেষণের ভিত্তিতে অধিবিদ যে তত্ত্বজ্ঞানের সন্ধান পেয়েছেন বলে বিশ্বাস করেন, তা-ই তিনি ব্যক্ত করে থাকেন তাঁর আধিবিদ্যিক ভাষায়। এই ভাষা কি সত্তার সার্থক বিবরণ, না অধিবিদের মনগড়া বিভ্রান্তিকর উক্তি, তা অবশ্যই বিচার-সাপেক্ষ ব্যাপার। কিন্তু বিচার-বিশ্লেষণের কষ্টসাধ্য কাজ হাতে নেয়ার পরিবর্তে আমরা যদি আগেভাগেই চট করে আধিবিদ্যিক ভাষাকে অর্থহীন বলে উড়িয়ে দেই, তাহলে আমাদের এই পদক্ষেপ হবে নিতান্তই একটি অযৌক্তিক ব্যাপার। এখন প্রশ্ন হলো: আধিবিদ্যিক ভাষার অর্থ বুঝার উপায় কি? শুধুমাত্র যৌক্তিক বিশ্লেষণ দ্বারা আমরা বড়জোর ভাষাসম্পর্কীয় জ্ঞান পেতে পারি, সত্তা সম্পর্কীয় জ্ঞান নয়। আর সত্তা সম্পর্কে সাক্ষাৎ জ্ঞান বা প্রত্যক্ষ প্রতীতি লাভ করেছেন বলে যদি কেউ দাবী করে থাকেন, নিছক ভাষাগত বিশ্লেষণ দ্বারা আমরা সে দাবী প্রমাণ কিংবা অপ্রমাণ করতে পারি না। অতীন্দ্রিয় সত্তা বলে যদি প্রকৃতপক্ষে কিছু থেকে থাকে (আর আমাদের প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও যদি এমন কোন সত্তা বিদ্যমান থেকে থাকে, তাহলে আমাদের কিই-বা করার আছে?), তাহলে তাকে জানার এবং তৎসম্পর্কীয় ভাষার অর্থ বা সত্যাসত্য পরীক্ষা করার একমাত্র উপায়, প্রথমেই সেই সত্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ ও অপরোক্ষ সম্বন্ধ স্থাপন। এই প্রত্যক্ষ পদ্ধতির অনুশীলন না করে, আমরা যদি শুধু ভাষা-বিশ্লেষণকেই আমাদের একমাত্র দার্শনিক হাতিয়ার বলে অবলম্বন করি, তা'হলে আর যা-ই আমরা করতে সক্ষম হই না কেন, সত্তাকে জানতে পারব না, এবং সত্তা সম্পর্কীয় কারো কোন উক্তির সত্যাসত্য বা যথার্থতাও নির্ণয় করতে পারব না।

এ-প্রসঙ্গে কেউ কেউ হয়ত মনে করতে পারেন যে, দার্শনিক প্রয়োগ-পদ্ধতি হিসাবে আমরা ভাষাগত বিশ্লেষণের গুরুত্ব অস্বীকার করছি। কিন্তু আসলে তা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। ভাষাগত বিশ্লেষণ যে কোন উক্তির তাৎপর্য নির্ণয়ের পক্ষে খুবই সহায়ক, তা আমরা আদৌ অস্বীকার করি না। আমরা শুধু মনে করি যে, গুরুত্বপূর্ণ হলেও

ভাষাগত বিশ্লেষণই আধিবিদ্যিক বচনের তাৎপর্য নির্ণয়ের একমাত্র উপায় নয়। ভিটগেন্‌স্টাইন ও অক্সফোর্ড দার্শনিকদের মতের উল্লেখ করে আমরা আগেই বলেছি যে, প্রসঙ্গ ও পরিস্থিতি ভেদে একই ভাষা বিভিন্ন অর্থ বহন করতে পারে। এ-জন্যই কোন বিশেষ বচন বা উক্তির অর্থ নির্ণয় করতে হলে প্রথমেই আমাদের উচিত, যে বিশেষ প্রসঙ্গে এবং যে বিশেষ উদ্দেশ্যে ঐ বচন বা উক্তির অবতারণা ও ব্যবহার, তার সার্থক ও পরিপূর্ণ মূল্যায়ন। তা না করে আমরা যদি নিছক যান্ত্রিক পদ্ধতিতে সেই উক্তির ভাষাগত বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হই, তাহলে আমরা তার অন্তর্নিহিত অর্থ ও তাৎপর্য উদ্ধারের আশা করতে পারি না। প্রচলিত মামুলী ভাষা বিশ্লেষণের ব্যাপারে এ-কথা যতটুকু সত্য, আধিবিদ্যিক ভাষা বিশ্লেষণেও তা সমানভাবে সত্য।

গ্রন্থপঞ্জী

Ayer, A. J., *Language, Truth and Logic*, Revised edition, London, 1953.

———, editor, *Logical Positivism*, Illinois, 1958.

Lewis, H. D., editor, *Clarity is Not Enough*, New York, 1963.

Ramsey, I. T., *Religious Language*, London, 1957.

Urmson, J. O., *Philosophical Analysis : Its Development Between the Wars*, Oxford, 1956.

Warnock, G. F., *English Phil sophy Since* 1900, Oxford, 1969.

Wisdom, J., *God, Logic and Language*, Oxford, 1951.

Wittgenstein, L., *Tractatus Logico-Philosophicus* (trans. by. C.K. Ogden) London, 1922.

———, *Philosophical Investigations*, 2nd edition, (trans, by G. E. M. Anscombe), Oxford, 1958.

Zuurdeeg, W. F., *An Analytical Philosophy of Religion*, New York, 1958.